ফিরে এসো নবজাগরণ, বন্ধ করো মিথ্যার কারবার

সাগর বিশ্বাস

ভূমিকা

"ব্যাটার বাড়ি খানাকুল, ব্যাটা সর্বনাশের মূল।"

রামমোহন রায়ের পিছনে পিছনে বালখিল্যদের কাঁসর-করতাল নিয়ে 'ধর্মসভার' নির্দেশে তাঁকে কলকাতা ছাড়া করার চেষ্টা। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি হুগলির গ্রামের বাড়ি ছেড়ে , সমাজসংস্কার, যুক্তিবাদী ধর্ম ও শিক্ষা প্রসারের জন্য কলকাতাকে কর্মস্থল বেছে নেন। তাঁর মতে, "পৌত্তলিকতা হিন্দুধর্মের বেদ বিরোধিতা, সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহের বিরোধিতার সাথে ধর্মের কোনো যোগ নেই। টোল এবং মাদ্রাসায় আদিম পিতার কাল্পনিক নাম মুখস্থ করানো হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-দর্শন, ভূগোল-অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয় না। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষার খোল-নলচে ঢেলে সাজাতে হবে।"

১৭৭৫-এর আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে সমগ্র উপনিবেশটি ব্রিটিশের হাতছাড়া হয়। স্পেন, পর্তুগাল ফরাসিরা দক্ষিণ আমেরিকা এবং কানজেয় তাদের উপনিবেশ রক্ষা করতে সমর্থ হয়। আমেরিকার বিদ্রোহ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বাধ্য করে, পশ্চিম গোলার্ধে উপনিবেশ বিস্তার বন্ধ করে, ভারতকেন্দ্রীক পূর্ব গোলার্ধে উপনিবেশ বিস্তারে। ১৭৮৯-এ ফরাসি বিপ্লব, ইংরেজ পুঁজিপতিদের আতঙ্কিত করে ইংল্যান্ডে গণরোষ প্রসারিত হলে মাথাগোঁজার ঠাঁই কোথায় হতে পারে। আফ্রিকা এবং ভারত উপমহাদেশ বসবাসের জন্য, আবহাওয়ার কারণে ইউরোপের মানুষদের পছন্দের তালিকায় ছিল না। অথচ আমেরিকার বিদ্রোহের শুরুতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৭৭৪-এ "পিটস ইন্ডিয়া অ্যাকট" পাশ করিয়ে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা খর্ব এবং ইংল্যান্ড সরকারের নির্দেশ পালন আবশ্যিক করে। ভারতীয়দের শিক্ষিত করতে, বছরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার নির্দেশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়া হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, পশ্চাৎপদ ভারতীয় সমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত করতে, ইংরেজ সরকারের উদারতা আঠারো শতকের শেষে হঠাৎ উদয় হয়েছিল। সেই সময়কার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্রিটিশকে বাধ্য করে ভারতের রাজধানী কলকাতাকে তাঁদের বাসযোগ্য করতে। প্রথমে শিক্ষা, তারপর ধাপে ধাপে পশ্চিমীকরণ। মাদ্রাজ এবং বোম্বাই দুটি শহর বিকল্প হিসাবে তাদের পরিকল্পনায় ছিল।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের আগে সরকারি কাজ হতো ফারসি এবং সংস্কৃত ভাষায়। পরে মেকলের সুপারিশে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৮১-তে ফারসি ভাষার জন্য কলকাতা মাদ্রাসা এবং সংস্কৃত ভাষার জন্য বারাণসীতে ১৭৯১-এ সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। সিভিলিয়ানদের স্থানীয় ভাষা শিক্ষার জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুরা যাতে শিক্ষার বিরোধিতা না করে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তত্ত্বাবধানে গরানহাটায় ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ

স্থাপন করা হয়। সংস্কৃত কলেজে একমাত্র ব্রাহ্মণদের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ছিল। অন্য বর্ণের ছাত্রদের পাদ্রিদের স্কুলে পড়াশুনা করতে হতো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্ববর্ণের জন্য সংস্কৃত কলেজের দুয়ার বহু পরে খুলে দেন। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে, ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য ইংল্যান্ড থেকে নির্দেশ আসে। সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যদের পড়ার সুযোগ না থাকায়, কলকাতার অব্রাহ্মণ এবং বর্ণ নিরেপেক্ষ গোষ্ঠী সর্বসাধারণের জন্য স্কুল-কলেজ খুলতে কোম্পানির উপর চাপ সৃষ্টি করছিল। অবশেষে ২০.১.১৮১৭ তারিখে গরানহাটার সংস্কৃত কলেজের একটা অংশে হিন্দু পাঠশালা এবং কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে, জুনিয়ার ডিভিশন "হিন্দুস্কুল" এবং সিনিয়র ডিভিশন "প্রেসিডেন্সি কলেজে" নাম ধারণ করে। বর্তমানে "প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়"। প্রথম প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানের মিলন ঘটল হিন্দু কলেজে। ডিরোজিও ইয়ংবেঙ্গল, নবজাগরণ, এই তিনটি শব্দের ব্যাখ্যার মধ্যে গোটা উনিশ শতকের ইতিহাসের ভিত্তিভূমি লুকিয়ে আছে। ১৭৭৮-এ, শ্রীরামপুরে ছাপাখানা স্থাপন হলে হাতে লেখা পুঁথির যুগ ছাড়িয়ে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, যুক্তি-তর্ক, মনের ভাব আদান-প্রদান ছাপার অক্ষরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। এই পর্যায়ে মুদ্রণযন্ত্রের তিন ভগীরথ—চার্লস উইলকিন্স (১৭৫০-১৮৩৬), উইলিয়ম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) এবং কেরি সাহেবের মুন্‌সি, রামরাম বসুর (১৭৫৭-১৮১৩) নাম উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

উনিশ শতকের প্রারম্ভে, জ্ঞানীপুরুষ বলতে, রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) এবং শহরে ধনীব্যক্তি বলতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬) নাম সবাই জানতেন। সর্বঘটে কাঁঠালিকলার মতো সবকাজে এঁরা দুজন যুক্ত থাকতেন। ধর্ম এবং সমাজ সংস্কার বিষয়ে রামমোহন স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। ফলে গোঁড়া হিন্দুরা তাঁর প্রতিপক্ষ হলো। দ্বারকানাথ ব্যবসায়ী। তিনি অর্থদান করে কর্তব্য পালন করতেন। বিতর্কিত বিষয় থেকে দূরে থাকতেন। রামমোহন ১৮৩১-এ ইংল্যান্ড গিয়ে ১৮৩৩-এ সেখানে মারা যান। দ্বারকানাথ ১৮৪২-এ ইংল্যান্ডে গিয়ে ফিরে এলে হিন্দু পণ্ডিতরা তাঁর "কালাপানি পার" যাবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত দাবি করেন। দ্বারকানাথ অস্বীকার করেন। প্রতিবাদে তাঁর স্ত্রী দিগম্বরীদেবী অন্নজল ত্যাগ করে আত্মহত্যা করেন। ১৮৪৬-এ দ্বারকানাথ চারজন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান। সেখানে ১.৮.১৮৪৬ তাঁর মৃত্যু হয়।

(অ) ধর্মসভা-হিন্দুকলেজ এবং ডিরোজিও এবং ইয়ংবেঙ্গল

রামমোহনের সতীদাহপ্রথা বন্ধের জন্য হিন্দুধর্মের শাস্ত্র ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার, ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করে ৪.১২.১৮২৯ তারিখে সতীদাহ বন্ধ করার আইন পাশ করতে। রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, ভবানীচরণ মিত্র প্রমুখ গোঁড়া হিন্দুরা "ধর্মসভা" গঠন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধের বিরোধিতা

করে। মামলা ইংল্যান্ড পর্যন্ত গড়ালে, রামমোহন সেখানে এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। ধর্মসভা পর্যুদস্ত হয়। ২৭.৯.১৮৩৩ ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু হলে ধর্মসভাপন্থীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। কিন্তু ইতিহাসের চাকা পিছনে ঘোরে না। রামমোহন, দ্বারকানাথ গত হলেও ১৫.৫.১৮১৭ তারিখে দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয় এবং রামমোহনের একমাত্র পুত্র রমাপ্রসাদের জন্ম হয় ২৭.৭.১৮১৭ তারিখে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী রামধন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম ১৫.৫.১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার বছরে এই তিন প্রগতিশীল বঙ্গসন্তান জন্মগ্রহণ করলেও এঁরা যখন হিন্দুকলেজে শিক্ষাগ্রহণে ভর্তি হয়েছিলেন ততদিনে প্রবাদপ্রতিম অ্যাংলোইন্ডিয়ান অধ্যাপক হেনরি ভিভিয়ান লুই ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) হিন্দুকলেজ থেকে ধর্মসভাপন্থীদের চক্রান্তে অধ্যাপনা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং আটমাস পরে ২৬.১২.১৮৩১ তারিখে মারা যান। ধর্ম, খাদ্য, সংস্কার বিষয়ে মুক্তচিন্তক, যুক্তিবাদী ডিরোজিওর মাত্র পাঁচ বছরের শিক্ষায়, তাঁর আটজন ছাত্র, যাঁরা "ইয়ংবেঙ্গল" নামে খ্যাত ছিলেন তারা প্রথমে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন', পরে জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, শুধু পূর্বাঞ্চল নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের পরাধীনতা থেকে মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল নামে খ্যাতরা হলেন—তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪-৫৫), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৬৮), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-৭৮), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮)।

ডিরোজিওর জীবনকালে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, পুরাতন ভাবধারা বর্জন করে শিক্ষা, ধর্ম, সামাজিক আচরণে যুক্তিযুক্ত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে, ভারতকে বিশ্বদরবারে উপস্থিত করার যোগ্য করে তোলেন, তাঁদের ইয়ংবেঙ্গলদের সমতুল্য "বিলম্বিত ডিরোজিয়ান" বলা হয়। তারা হলেন—মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-৫৮), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), রমাপ্রসাদ রায় (১৮১৭-৬২), কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২-৭৩), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)।

১৮১৭-তে হিন্দুস্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার এবং তিনজন বিখ্যাত বিলম্বিত ডিরোজিয়ানের জন্মের দ্বিশতবর্ষ অতিক্রমণ করবে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে। পৃথিবীর মানচিত্রে নিজের অবস্থান নির্ধারণের জন্য যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, বিশ্ব ইতিহাসে নিজের ঐতিহাসিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ইতিহাসের জ্ঞান প্রয়োজন। অনেক হিন্দু পরিবারে শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে "চোদ্দপুরুষকে" পিণ্ডদান করা হয়। পঁচিশ বছরে এক পুরুষ ধরলে, সাড়ে তিনশ বছরের স্মরণ অনুষ্ঠান। অথচ দু'শ বছর, অর্থাৎ আট পুরুষ আগে, নিলামে ক্রীতদাস বিক্রি হতো, হিন্দু বিধবাদের সতীদাহ অথবা জীবনভোর বৈধব্য যন্ত্রণা নিয়ে বাস করতেন। পুরুষেরা বহু বিবাহ করা সামাজিক কর্তব্য মনে করতেন। ফারসি এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন কাহিনি এবং কল্পিত ধর্মশাস্ত্র ছাড়া মাদ্রাসা এবং টোলে শিক্ষার কিছু ছিল না।

নেক কাজের জন্য বেহেস্তে মদের নদীতে স্নান এবং সুন্দরিদের বিনা খরচে সঙ্গলাভ এক ধর্মে, শনির আগুন নজরে ভাগ্নে গণেশের মুণ্ড ভস্মীভূত এবং হাতির মাথা কেটে জুড়ে দেবার মতো উদ্ভট গল্প দিয়ে অন্য ধর্মের লেকেদের মগজধোলাই করা হতো। তারপরে পৃথিবীর নদী দিয়ে বহু জল বয়ে গেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক প্রগতি হয়েছে কিন্তু পুরাতন ধ্যান-ধারণা অনেকের সঙ্গ ছাড়েনি। পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, সামাজিক প্রগতির ঐতিহাসিক বিচার ধারার সাথে এঁরা নিজেদের অবস্থান নির্ণয়ে ব্যর্থ। আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ রাজনৈতিক অনেক দল, বস্তাপচা, মাদ্রাসা, টোল, চার্চের শিক্ষা—"অত্যাচার, অনাহার, দারিদ্র্য সহ্য করো, পরজন্মে সুখী হবে।" এই অসত্যের প্রচারক। ইয়ং বেঙ্গলরা, গোমাংস হিন্দুদের খাদ্য নয় এবং শূকর, কচ্ছপ মুসলমানদের খাদ্য নয় একথা বিশ্বাস করতেন না। তাঁদের কথার প্রতিধ্বনি করলেন স্বামী বিবেকানন্দ, "যাঁরা ধর্মকে হেঁশেলে ঢুকিয়েছেন তাঁরা অধার্মিক।" ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি গুরুভাইদের নিয়ে ভারত ভ্রমণ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার আগে, বাগবাজারে কালু মিঞায় দোকানে নিষিদ্ধ মাংস (মুরগি) খাইয়ে সবাইকে জাত-পাত, খাদ্যাখাদ্যমুক্ত করে শুরু করেন ভ্রমণ। শ্রীরামকৃষ্ণের "যত মত তত পথ" নবজাগরণ পর্বের উদার মতবাদের প্রতিধ্বনি ঘটেছিল।

উনিশ শতকের যুক্তিবাদ ও একুশ শতকের ভণ্ড শাসকেরা

উনিশ শতকের যুক্তিবাদী শিক্ষা শুরু হলে ছাত্ররা পণ্ডিতদের প্রশ্ন করত—"হিন্দুরা গোমাংস খায় না অথচ মীন (মাছ), কুর্ম (কচ্ছপ) বরাহ (শূকর) খায়। দশ অবতার অনুসারে, ভগবান বিভিন্ন যুগে এই অবতার রূপ নিয়েছিলেন। গো অবতার নেই। সমস্ত পশু বন্যপ্রাণী। মানুষ গৃহপালিত করতে পেরেছে ছাগল, ভেড়া, গরু, মোষ, ঘোড়া ইত্যাদি কয়েকটি প্রাণীকে। আদিম অবস্থায় যে পশুদের জঙ্গলে শিকার করতে অনেক পরিশ্রম করতে হতো। পালিত অবস্থায় তাদের বংশবৃদ্ধি করে, খাবার ও কৃষিকাজের সহায়ক হয়। বেদ এবং মহাভারতের সময়ে গোমাংস আনুষ্ঠানিক ভোজে পরিবেশন হতো। যেহেতু গোমাংস, মোষের মাংস, চমরি গরুর সাংস, নীল গাইয়ের মাংস, হিন্দু ধর্মের কোনো আচার সংহিতায় নিষিদ্ধ নয়, কারণ বিহীন কার্য হয় না। সুতরাং গোমাংস এবং ইংরেজি ভাষায় "বিফ" বলতে গো, মহিষ ইত্যাদির মাংস বুঝায় তা হিন্দুরা যাঁরা ইচ্ছা করেন, ভোজনে অন্যায় নাই।" পণ্ডিতরা ছাত্রদের পাল্টা প্রশ্ন করে "হিন্দুরা গোমাংস না খেলে কার্য-কারণহীন বলছ, মুসলমানরা কচ্ছপ এবং শূকর খায় না কী কারণে? তারা কী হিন্দুদের দেবতা কচ্ছপ, শূকর হয়েছিল বলে স্বীকার করে?" ছাত্রদের উত্তর ছিল—"মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে একমাত্র মাছ ছাড়া অন্য প্রাণীকে মন্ত্র পড়ে হালাল করে মাংস খাবার নিয়ম আছে। যেহেতু কচ্ছপ উভচর, তার হালাল প্রয়োজন। কিন্তু ছোঁয়া লাগলেই গর্দান চাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। তাই অখাদ্য। শূকর না খাবার বিষয়টা এসেছে মিশর থেকে, আরবে এবং মুসলমান ধর্মে। সেত, ইশিস, ওসারিস—দুই ভাই এবং বোনের কাহিনি। সেত, ওসারিসকে হত্যা করে ইসিসকে বিয়ে করার চক্রান্ত করে, ওসারিসের ছেলে সেতকে

হত্যা করে। প্রাচীন মিশরের পৌত্তলিক ধর্মে, সেতকে শূকরের প্রতীক করা হয়। মিশর, পৌত্তলিক, রোমান, গ্রিক, খ্রিস্টান, সর্বশেষে মুসলমান ধর্মের শাসনে আসে। কিন্তু মিশরে কোনো ধর্মের লোক, শূকরের মাংস, ঘৃণ্য সেতের প্রতীক বলে খায় না। যেহেতু হালালের সমস্যা নাই ইউরোপ এবং আমেরিকায় বহু মুসলমান যেমন শূকরের মাংস খান (যেমন মহম্মদ আলি জিন্নাহ খেতেন—বিচারক এম.সি. চাগলার আত্মকথন অনুসারে) তেমনি বহু হিন্দু ভারতীয়রা বিফ তাদের প্রধান খাদ্য করে ফেলেছেন। মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা আবিষ্কারক রাধানাথ শিকদার এবং অন্য ইয়ংবেঙ্গলরা প্রাকাশ্যে বলতেন, "যতদিন ভারতবাসী অধিক পরিমাণে গোমাংস না খাইবে, ততদিন শক্তিশালী জাতি হিসাবে পরিগণিত হইবে না।"

গোটা উনিশ, বিশ শতাব্দী বৈষ্ণব—শাক্ত, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান খাদ্যের ব্যাপারে স্বাধীনতা ভোগ করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের পিতা তাঁর নিরামিষ খাবারের প্রতি আগ্রহের জন্য আমিষ খাবার উপদেশ দেন। মহাত্মা গান্ধী ছাগলের মাংস গোপনে খেয়ে, স্বপ্নে পেটের মধ্যে ছাগলের ডাক শুনতে পান। দাক্ষিণাত্যে নিরামিষ পরিবারে মছলি খানেওয়ালারা" বাড়িভাড়া পায় না। খাদ্যাভ্যাসের বিভিন্নতার জন্য ছোটোখাটো সমস্যা ছিল। একান্নবর্তী পরিবারগুলিও বাদ ছিল না। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক সংগঠন দীর্ঘ দুশ বছরের ইতিহাসে খাদ্যাভ্যাসকে দ্বন্দ্ব হিসাবে ব্যবহার করেনি। শিক্ষা, খাদ্যকে দ্বন্দ্ব হিসাবে ব্যবহার, মানব সমাজের মূলে আঘাত করা। মানব সভ্যতা বিরোধীরা ছাড়া অন্যরা একাজ করে না।

অন্য রাজনৈতিক দলগুলির মূল সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে একটি দক্ষিণপন্থী, অবৈজ্ঞানিক, ভাববাদী দল কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন ক্ষমতায় আসে ২০১৪-তে। যেহেতু এই দলটি মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি, ১৩০ কোটি ভারতের অধিবাসীর মূল সমস্যার সমাধান এদের লক্ষ্য হতে পারে না, অথচ অধিকাংশ লোকের সমর্থন ছাড়া শাসন ক্ষমতায় থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে, এক ধর্মের লোকের উদ্ভট কাজকর্মে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। ভারতের সংবিধানের সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হঠাৎ খাদ্য, জীবন জীবিকায় গরু-সহ সমস্ত গৃহপালিত পশুর ব্যবসা, পালন, ব্যবহার কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করে। ভারতের সর্ববৃহৎ রপ্তানি ব্যবসা, পশুমাংস এবং চামড়ার। এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ রপ্তানি ব্যবসা, পশুমাংস এবং চামড়ার। এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক। "আইন করে ভাতে মারব, দেশছাড়া করব" এই মতলবে এক অংশের মানুষকে উৎসাহিত করছে অন্য অংশকে আক্রমণ করতে। হিটলারি পদ্ধতি। দুটো বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগে পোড়খাওয়া মানুষ। কালো টাকার ভাগ জনপ্রতি তেরো লাখ দেখিয়ে, ক্ষমতা হাতে নিয়ে, কাঁচকলা খাইয়ে, মাংস-চামড়ার ব্যবসা আমেরিকাকে তুলে দিতে চাইছে। লেঙুর ফ্যাসি বাহিনী দৈহিক আক্রমণ শুরু করেছে। সমস্যা দ্রুত ঘনীভূত হচ্ছে। ২০১৭-তে আর এক নবজাগরণ প্রয়োজন।